সকালের দাঁড়ি কমা

আপন মাহমুদ

কথাপ্রকাশ

সকালের দাঁড়ি-কমা
আপন মাহমুদ

গ্রন্থস্বত্ব : ফাহমিদা আহমেদ

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক : মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক : মিজান রহমান

কথাপ্রকাশ, ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট, তৃতীয় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬৫০৯১৯, ৭১৭৫০৯৫, ৭১২৫০৫৪, ৭১২৪৬৫৩, ০১৯১২৬০৩৪৬১

শব্দগ্রন্থক : কথা কম্পিউটার্স
৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট, তৃতীয় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

মুদ্রক : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

শো-রুম : ৩৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

মূল্য : ৭০.০০

SHAKALER DARI KOMA
Apon Mahmud

Published by Mohammed Jashim Uddin
Kathaprokash
87 Aziz Super Market, (2nd Floor), Shahbag, Dhaka-1000
First Published : February 2011
Price : 70.00

ISBN : 984-70120-0074-8

উ ৎ স র্গ

আনোয়ারা বেগম, মা । আবদুর রব, বাবা ।
এক দুয়ারে যাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন
হাজার দুয়ার নিয়ে!

মা প্রজাপতি ও অন্যান্য ছায়া । ৯-১৮
ভাঙা শ্লেট । ১৯
দর্শক । ২০
লালবাতির বায়োগ্রাফি । ২১
বটগাছ । ২২
দৌড় । ২৩
বিলবোর্ড । ২৪
গল্প : শরীরের মতো বড় । ২৫
শূন্য খাঁচা । ২৬
সাঁতার । ২৭
টু রোকেয়া হল । ২৮
বেহালাবাদক । ২৯
বিকেল, মনে মুনিয়া । ৩০
সতিনের ছেলে । ৩১
অপাদি, আপনাকে । ৩২
দেবলীনাদের গল্প । ৩৩
৩৪ । সত্য-মিথ্যা
৩৫ । পাহারাদার
৩৬ । সম্পর্ক
৩৭ । ফুলসঙ্কটের দিনে
৩৮ । ভাবের মোড়ে
৩৯ । রেলগাড়ি
৪০ । জামতলা/পায়রা
৪১ । কথা, পাহাড়ের সঙ্গে
৪২ । স্কাউটবালিকা
৪৩ । পানসি
৪৪ । গোপন সন্ন্যাস, কবিতার দেশে...
৪৫ । কাক-কোকিল ভোরের গান
৪৬ । সপ্তম শ্রেণী থেকে কুয়াশা পর্যন্ত
৪৭ । উল্টোপথ
৪৮ । ঝরাপতার উপহাস

মা প্রজাপতি ও অন্যান্য ছায়া

মায়ের উদ্দেশে বাবা যে চুমুটা ছুড়ে দিয়েছিলেন বাতাসে
শুনেছি, সেই হাওয়াই চুমুটা থেকেই জন্ম নিয়েছিলো
পৃথিবীর প্রথম প্রজাপতি

মা, পৃথিবীর যেকোনো নারী থেকে যাকে কখনোই আলাদা করা
যায় না—তাকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত-বিভ্রান্ত সেই প্রজাপতিটার
ডানা থেকে যখন টুপটাপ ঝরে পড়ছিল রঙের আকুতি—রঙের
সেই অপচয় ঘোচাতেই সম্ভবত জন্ম হয়েছিলো পৃথিবীর আর
সব প্রজাপতির

মাকে বাবা খুঁজে পেয়েছেন সেই কবে! অথচ, তার মুখের দিকে
তাকিয়ে কখনোই মনে হয়নি—জীবনে একটাও প্রজাপতি তার
খোঁপায় বসেছে।

দুই

গোলাপ অথবা চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক কেমন ছিল
জানি না—তবে কোনো এক শীতসকালে ঘরের পেছনে অকারণে
ফুটে থাকা কিছু ঘাসফুলের সঙ্গে মা আমার আলাপ করে দিয়ে
বলেছিলেন,‘ জীবনের যত কফ-থুথু আর উড়াল হারানোর
বেদনা আমি জমা রেখেছি এই ঘাসফুলের কাছে, এমনকি প্রসব
বেদনাও’—সেই থেকে যেকোনো নীল ঘাসফুলই আমার মায়ের
প্রতিনিধিত্ব করে—যার আজো কোনো বাজারমূল্য নেই

এখনো শীত আসে পৃথিবীতে, আসে বসন্ত—গোলাপ অথবা
চন্দ্রমল্লিকারাও এখনো আলতা পরে পায়ে—তবু পৃথিবীর যত
খুন, প্রতারণা আর ব্যর্থ-প্রেমের কবিতা নিয়ে আমি সেই
ঘাসফুলের কাছেই যাই

চোখ বন্ধ করে একটু দাঁড়াই...

তিন

আমার জন্মের রাতে একটাও নক্ষত্র খসে পড়েনি মাটিতে—যদিও
আপন-আকাশ ভুলে মা আমাকেই তুলে ধরেছিলেন তার প্রার্থনার
করতলে—প্রার্থনা শেষে মা আজো চোখ মোছেন—যে চোখে খুব
কাছের নক্ষত্রটাকেও ঝাঁপসা দেখায়!

বাবা রাজমিস্ত্রি, দাদি আত্মহত্যা করেছেন পেটের পীড়ায়—তবু
আমার কখনো সাব-কন্ট্রাক্টর কিংবা এলএমএফ ডাক্তার হতে ইচ্ছে
করেনি—বরং নক্ষত্র হতে না-পারার অহেতুক বেদনা নিয়ে আমি
আজো বেজে চলেছি সেই বেহালাবাদকের আঙুলে—ঘনকুয়াশার
দিকে নিরন্তর হেঁটে যাওয়া যার অমোঘ নিয়তি

আমার জন্মধ্বনিতে কাঁপেনি আকাশ—উৎসবের একটাও বাতি
যায়নি নিভে—কেবল কোকিল, কোকিল উড়ে গেছে দূরে...

চার

মা, তোমার বেজারমুখের প্রতিবেশী আমি এক চুপচাপ বালক—নিজেকে
হারিয়ে ফেলেছি সেই কবে, নবম শ্রেণীতে—নিজেকে ডুবিয়ে ফেলেছি
সেই কবে, জিল্লাল মিয়ার দিঘিতে—এখনো আনানসির মতো ঘুরছি
দ্যাখো, বন্ধুর লোভে...

মা, তোমার প্রসববেদনা থেকে সেই কবে পথের শুরু—হাঁটতে
হাঁটতে পৃথিবী দুপুর হয়ে গেছে—তবু, বন্ধুর মতো কোনো ছায়া
নেই চারপাশে—বটের ছায়াও কিনতে পাওয়া যায় না বাজারে।

পাঁচ

মায়ের কপালের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা উৎকণ্ঠাটুকু নিয়ে এসেছি
আমারও নামের পাশে লেখা যেতে পারে 'সম্ভাবনা'—সম্ভাবনার
যে দ্বার লাঙলের খুলবার কথা—তার দরোজায় আজো বসে
আছেন বাবা—যার ঘোলাটে চোখে এখনো থকথক করছে
কাদাপানির সংশয়, আড়ষ্টতা...

আড়ষ্টতার হাত ধরে কতদূর যাবে মায়ের বোবা ছেলেগুলো!

আমারও উদ্দেশ্য ছিল দূর—অথচ, ঘরের কাছেই বুনোফুল দেখে
থমকে দাঁড়াতে হলো—দাঁড়িয়ে আছি

শুনেছি, দাঁড়াতে জানলে সকল দূরই একদিন নিকটে আসে।

ছয়

স্বপ্ন থেকে মাইল খানেক দূরে আমাদের ঘুড়ি উড়ছিল—ঘুড়িতে
আঁকা ছিল চোখ—চোখে ছিল বোকা চাউনি—শেষবার নারী
থেকে বেরিয়ে আসার পথে মায়ের সঙ্গে দেখা—মা তখনো
বাবা ও তার সম্পর্কের দূরত্ব মাপছিলেন—মাপছিলেন
সংসার নিয়ে দেখা তার প্রথম ও শেষ স্বপ্নের পরিধি—জানি না,
মায়ের সমূহ-স্বপ্নের যোগফল কত। তবু কলসি কাঁখে
কোনো এক মৃত পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের ছবি—আমাকেই
তাড়া করে—আমাকেই পিপাসাবার্তা পাঠায়!

আমি আছি সেই সব মেঘের দিকে তাকিয়ে—বৃষ্টি না হয়ে
যারা কেবল মেঘদূত হতে ভালোবাসে।

সাত

আমার মায়ের মুখ মনে করে পৃথিবীতে শ্মশান
নেমে আসে—চিড়িয়াখানার হরিণশূন্য খাঁচাটিও
এগিয়ে আসে কাছে—আমি বরফ-রাজ্যের সর্বশেষ
অধিপতির মতো পায়ের তালুতে হাত রেখে মেপে
নিই পথ—বুঝে নিই প্রশান্তি ও মৃত্যুর তফাত

ভাবি, এবার আত্মমুখী বন্ধুরা এলে বলবো : তোমাদের
জন্য রয়েছে অবারিত শ্মশান আর গোরখোদকের
ভাবলেশহীন হাসি—যে যার পাওনা বুঝে নিতে পারো।

আট

মায়ের মুখ মনে এলে নিজেকে রক্ষকশূন্য গোলবার মনে হয়—মনে হয় সব কটি গোলই হয়ে যাচ্ছে—কিছুতেই ঠেকাতে পারছি না—অথচ, রেফারির বাঁশি যে পক্ষেই বাজুক তারই জেতার কথা

হার-জিত প্রসঙ্গে ইদানীং মা খুব একটা কথা বলেন না, মাঝেমাঝে দূর দীর্ঘশ্বাসের পালক ঝরাতে ঝরাতে বলেন, 'যারা জিততে জিততে জিততে ভুলে গেছে—যারা হারতে হারতে হারতে ভুলে গেছে—তাদের সবার উচ্চতাই সমান'

মানুষের উচ্চতা সমান ভেবেই আমাদের গান শুরু করার কথা—অথচ রেফারির বাঁশি কেবল জেতাবার জন্যই বাজে—হারাবার জন্যই বাজে!

নয়

মায়ের পান-খাওয়া ঠোঁটে যেদিন অনেক ভ্রমরের কাতরতা ছিলো—সেদিনও বাবা বিড়ির আগুনে সেলাই করছিলেন কোনো এক বিধবার সাদাশাড়ি—বিধবার শাড়ি থেকে ছড়ানো মেঘে আর যাদের আকাশে উঠেছিলো ঝড়—আর যারা হারিয়েছিলো প্রজাপতি-শৈশব—তাদের কেউ কেউ আমার বন্ধু—বন্ধুদের কেউ মায়ের কাছে থাকে—কেউ হোস্টেলে, কেউ বা হতাশার মোড় থেকে প্রায়ই আত্মহত্যার দুয়ার পর্যন্ত যাওয়া-আসা করে—অথচ, এসব দেখেও এখনো কোনো কোনো বাবা মায়েদের লাল ঠোঁট উপেক্ষা করে!

আমরা মাঝেমধ্যেই রাধার বাঁধভাঙা ব্যাকুলতা নিয়ে কথা বলি—কথা বলি মানুষের নগ্ন হবার সহজাত প্রবণতা নিয়ে—যদিও আমাদের কারো জানা নেই, কৃষ্ণ ও তার বাঁশির মধ্যে কে বেশি প্রভাবক ।

দশ

পাতা ঝরার শব্দ হতে ফুল ফোটার শব্দ পর্যন্ত হেঁটে
যেতে হবে—এরকমই ইঙ্গিত ছিল হাতের—হাত ছিল
নিজের কাঁধে—কাঁধে ঝুলে ছিল ব্যাগ—ব্যাগে ছিল
মায়ের ছবি—মায়ের ছিল তাকিয়ে থাকা—তাকিয়ে
থাকা মানে বয়ে যাওয়া নদী

মা আমার যাচ্ছেন বয়ে, নিরবধি...

ভাঙা শ্লেট

কতগুলো মৃত পাহাড় কচ্ছপের মতো বসে আছে বুকে
মালগাড়ি মনে করে যাদের পিঠে তুলে দিই আজো
সিগারেটের বাক্স, দেশলাই—তুলে দিই ডাক্তারের
নিষেধাজ্ঞা, মায়ের অনুরোধ...

আঁটালির মতো গোঁ-ধরে বসে থাকা অদ্ভুত মালগাড়িটা
পুরোনো স্টেশনের কোনো এক পরিত্যক্ত দুপুরের মতো
আমাকে নিঃসঙ্গতার গান গেয়ে শোনায়!

মনে পড়ে, কচ্ছপ মারতে গিয়ে একদিন ভেঙে ফেলেছি
প্রিয় শ্লেট, খড়িমাটি...

কে জানে, সেই ভাঙা শ্লেটেই তোমার নাম লেখা ছিল কি-না!

দর্শক

শুকনো পাতাকে তামাক ভেবে প্রপিতামহের ঘোলাটে চোখে
তিরতির করেছিল যে আলো—তার সাথে দেখা হয়ে যায়
খরার হাতে ধরা পড়া প্রিয় দিঘির টুকরো টুকরো জলে

জলের সাথে আলোর খেলা চোখের মাঠে ভালো
এখানেও মানুষ রেফারি;
আলো চাইলে জল হারে
জল চাইলে আলো
জলের নয়, আলোর নয়—রেফারির হেরে যাওয়া
দেখবো বলে গ্যালারি ছাড়িনি আজো ।

লাল বাতির বায়োগ্রাফি

কী হবে রঙের কথা বলে—রঙের যাদুকর প্রজাপতি—সেও জানে না কতটা বিভ্রান্তি
নিয়ে তার ওড়াউড়ি! একদিন না-বুঝেই নীল-পেন্সিল হাতে এঁকে ফেলতে চেয়েছি
নারীনাভির সবটুকু গভীরতা—সেই থেকে আমি অন্ধ—সেই থেকে যেকোনো গর্তই
আমাকে লাল বাতির বায়োগ্রাফি শোনায়

রঙের প্রসঙ্গ এলেই সেই বেহালাবাদকের কথা মনে পড়ে—বেহালা বাজাতে বাজাতে
যে কি-না আকাশের সবটুকু নীল খসাতে চেয়েছিল—অথচ, সে এখন নীল-
প্রতিবন্ধীদের সভায় নিয়মিত সভাপতিত্ব করে! আর সবুজ অথবা কালোর প্রসঙ্গ
উঠলেই যে বাদক খুব বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাতে থাকে—যা দেখে যেকারোই মনে
হতে পারে রঙের যাবতীয় ভেলকিবাজির সঙ্গে তার গোপন আঁতাত রয়েছে—এসব
জানি, জানি বলেই, রংবিষয়ক যেকোনো গল্প লিখেই আমি কেটে দিই—কারণ আমি
তো জানি না—সাইমাদের বাম স্তনে যে তিলটা, তার মধ্যে অন্ধকার ছাড়া আর কী
কী রঙের চাতুরি আছে!

হতে পারে রঙে আমার বিভ্রান্তি বড় বেশি—হতে পারে ভুলপাঠে রঙ মুগ্ধ করেছে
আমাকে, কিন্তু তোমরা? তোমরা কেন আজো লাল জামা পরো—আজো কেন
লালের ভেতর, নীলের ভেতর তোমাদের ওঠা-নামার সিঁড়ি!

বটগাছ

আমার মাথায় শেকড় রেখে একটা বটগাছের বেড়ে উঠবার কথা ছিল—কথা ছিল নিদাঘ দুপুরে পাতা নেড়ে নেড়ে সে সবুজের নেতৃত্ব দেবে, ছায়াদের অভিভাবক হবে, হবে পাখিদের আশ্রম—তার কিছুই হলো না—আমার ফলাকাঙ্ক্ষী মা-বাবা বটগাছের পরিবর্তে আমার মাথায় মধ্যবিত্তীয় একটা ফলের বীজ বপন করে দিয়েছেন—আর কতটা পরিচর্যা করলে গাছটি সামাজিক হবে, ধার্মিক হবে, সুস্বাদু ফল দেবে—তারই দেখভাল করছিলেন আমার শিক্ষক-শিক্ষিকারা

তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমি এখন একটা সুশীল ফলগাছ—নিয়মিত অফিসে যাই—বাড়িতেও টাকা পাঠাই

আমার আর বটগাছ হওয়া হলো না ।

দৌড়

যেটুকু পথ পেরোতে বন্ধুদের তিন মিনিট লাগতো—তা অতি□ম করতেই আমার লাগতো কমপক্ষে ত্রিশ মিনিট—এভাবেই একদিন আমি খুব পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম—পেছনে তাকালে আমাকে দেখতে পেতো না কেউ—পেছনে কেবল ঝরাপাতার ওড়াউড়ি, ফেল করা বালকের মুখচ্ছবি...

ইজিপশিয়ান সেই কচ্ছপের মতো এখন আমি তোমার কাছে পৌঁছে গেছি! কেউ নেই চারপাশে—চল, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা নতুন করে নিজেদের উচ্চতা মাপি—আর সবচে দ্রুতগতিসম্পন্ন বন্ধুটিকে প্রশ্ন করি, 'তোমার খোঁড়া বন্ধুটি কেমন আছে'

দৌড় ভালোবেসে যারা আজন্ম হতে চেয়েছিলো প্রথম—দ্যাখো, তাদের কেউ কেউ এখনো নিজেদের কাছেই পৌঁছাতে পারেনি! অথচ, বকুলপাড়ার পঙ্গু ছেলেটিই একগুচ্ছ ঘাসফুল নিয়ে এসে নিজেকে জয়ী ঘোষণা করলো!

বিলবোর্ড

তোমাকেই ডাকতে চেয়েছিলাম পেছন থেকে, জানাতে চেয়েছিলাম
ফুল, পাখি আর প্রজাপতি রাত—অথচ, কোলাহল এসে কেমন
আড়াল করে দিলো সব, লোকাল বাস এসে বাজালো হর্ন!

তোমাকেই খুঁজতে গিয়েছিলাম বিকেল-বিকেল মাঠে—অথচ
সন্ধ্যা, সন্ধ্যারা সব ঘরে নিয়ে গেল! রাত্রি হাসলো হা হা...

তোমাকেই জানাতে চেয়েছিলাম কেন ঘুম হয়নি সুদীর্ঘকাল—শোনাতে
চেয়েছিলাম মেঘ, বৃষ্টি ও নারী নূপুর থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গান—অথচ,
শীতকাল এসে কবিতার দিকে তাকিয়ে বললো 'কুয়াশাই জয়ী'!

তোমাকেই ডাকতে চেয়েছিলাম পেছন থেকে, অথচ বিলবোর্ড
এসে সামনে দাঁড়ালো!

গল্প : শরীরের মতো বড়

অনেক বন্ধু তোমার, অ-নে-ক বন্ধু—গল্প করো তাদের—বিছানায় কে কত কম
বয়সী, কার কতো কৌশল, একজন তো দেখতে ভীষণ... অথচ, মেঘ জমার আগেই
জল ঢেলে দেয়, প্রায়ই—গল্প করো তুমি—কার বুকে কেমন ঝলমল করেছে রেশমি
চুড়ির জরি, কে তোমার সব লাল লিপস্টিক খেয়ে ফেলে!

গল্প শুনি তোমার মুখে, গল্পগুলো শরীরের মতো বড়!
গল্পগুলো ভালোবাসার চে ছোট!!

মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে ১৮ পর্যন্ত নামি—পেছনে ফেলে আসা মার্বেলগুলো গড়িয়ে
ওঠে, বাদামি চোখে তাকায়, বিকেলের আলোছায়ায়, অচেনা ঢিল এসে পড়ে, জল
নড়ে , তিরতির মাঠঘাট—এসব আবোল-তাবোল গল্প শুনতে চাও—আর একাদশ
শ্রেণীর মতো হেসে বলো, 'তুমি ঠিক আগের মতো, এখনো গানের বোঝা বহো...'

একটা বন্ধু ঝরে গেলে অন্তত দুইটা বন্ধু ফুটিয়ে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না
তোমার—পুরোনো বোতাম হারাবার আগেই নতুন বোতাম কিনে রাখতে হয়, প্রায়ই
উপদেশ দাও—মাঝে মাঝেই ভাবি, তোমার মতো হবো—কিন্তু, হারানো বোতামটা
খুঁজতে খুঁজতেই আমার দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে—পাড়ে বাঁধ দেবার আগেই প্লাবন ঢুকে
পড়ছে জমিনে ।

শূন্য খাঁচা

চিড়িয়াখানায় যাওয়ার পর ডোডোপাখির কথা মনে পড়ে
টের পাই সাঁকো ছিলো, আছে
কেবল এপার-ওপার কারো যাওয়া-আসা নেই

তোমার প্রস্থান যে খাঁচাটি শূন্য করেছিল
সেই-ই আমাকে ফাগুনবিদ্রূপের হাত থেকে রক্ষা করে

গোলাপের উল্টোহাসির তাড়া খেয়ে আমি, আজো
সে শূন্য খাঁচার শিক শক্ত হাতে ধরি

ভাবি, চিড়িয়াখানার শূন্য খাঁচা আছে—আমারও আছে।

সাঁতার

এক-একটি নদী পেরোনোর চে এক-একটি নারী পেরোনো অনেক ভয়ের
কেননা এক-একটি আহত পাখি এক-একটি মৃত পাখির চেয়ে অনেক
বেশি বেদনা বহন করে—তবু আমাদের পেরোতে হয়, পেরোতে হয়
সুদীর্ঘ ঝড়ের আর্তনাদ...

এক-একজন নারীর সঙ্গে পরিচয় হওয়া মানে এক-একটা
অচেনা নদীর দেখা পাওয়া—এক-একটা নারীর চলে যাওয়া
মানে এক-একটি নদীর মরে যাওয়া...

বস্তুত, কতগুলো মৃত নদীতেই আজন্ম সাঁতরায় মানুষ, কতগুলো
ভুল মানুষ আর ভুল সম্পর্কের যোগফলই মানুষের প্রাপ্তি

এক-একটি নদী পেরুনোর চে এক-একটি নারী পেরোনো অনেক
ভয়ের—কেননা, সাঁতার জানলেই সব নদী পেরোনো যায় না।

টু রোকেয়া হল

আমাদের প্রায় সবারই কিছু না-কিছু গল্প আছে—আছে শৈশব-মোমে জ্বলা
দু-একটি সিঁদুরে মুখ—দূরে, কাশবনের ভেতর থেকে বারবার বেরিয়ে আসা
ছেলেগুলো আমাদের বন্ধু—ভালোবাসার জন্য একদিন আমরা পকেটের গোপন
আধুলিটাও ভিক্ষুকের থালায় রেখেছি—অথচ, সাইমারা দেশছাড়া—শিরিনেরা
ঘোলাজলে দ্যাখে মুখ—আর লোপাদের মুখে কেবল সন্তানের দুষ্টুমি!

আমাদের কোনো কোনো বন্ধু স্বর্গে যাবে বলে মদের টেবিলেও মগজে টুপি
রাখতো—প্রায়ই আমরা বালিকাময় বিকেল ঘুরতে যেতাম—মাঠের মাঝখানে
বসে দেখতাম দূর্বাঘাসের চে অধিক নরম স্বপ্ন—অথচ, প্রিয় বন্ধুটির
কবরে মাটি না-দিতে পারার আক্ষেপটুকুও আজ আমাদের কারো নেই!

ঈশ্বর যেখানে আছে থাকুক, ওপথ আমার সরু মনে হয়—আমাদের চিয়ার্সের
শব্দ থেকেই শুরু হবে অনাগত গানের প্রবাহ—এই ভেবে এখনো আমরা
পানশালায় যাই, যদিও পুলিশ দেখলেই আজকাল মদের নেশা কেটে যায়!

আমাদের রয়েছে লিখতে না-পারার মতো দুর্যোগ আর ভালোবাসতে না-পারার
মতো অনটন—বন্ধুরা, আবহাওয়া ১৬ আগস্ট থেকেই খারাপ—সমুদ্রে লঘুচাপ,
নৌকা ভিড়ে আছে উপকূলে, ঊনুনে শূন্যহাঁড়ি—জানি, বুকের আগুনে একটা ডিমও
সেদ্ধ হয় না—তবু,স্বর্গ যদি থাকে, তোমরা যাও—আমি রোকেয়া হলের দিকেই...

বেহালাবাদক

আমি আছি অজস্র পাতাঝরার শব্দ নিয়ে—এই শীতে যার
কিছুটা বি হবার কথা একজন বৃদ্ধ বেহালাবাদকের অবশিষ্ট
হাসিটির বিনিময়ে—শুনেছি, যেকোনো আত্মহননকারী
মানুষের কপালের ভাঁজেই এরকম একটি হাসি লুকিয়ে থাকে—
যা কিনা সুর ও শিল্পপ্রিয় মানুষের প্রতি ঈশ্বরের শেষ উপহার

ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক পাশের বাড়ির অহংকারী ভালো
ছাত্রীটির মতো—যে আমাকে সঙ্গে নেয়নি, আবার ফেলেও যায়নি

শীত থেকে বসন্ত এতো দূরে যে, সেই বৃদ্ধ বেহালাবাদকের সঙ্গে
আমার আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই ।

দুই

সেই বৃদ্ধ বেহালাবাদক এখন কোথায়—যার হাতের ওঠা-নামায় স্থির হয়ে
আছে আমাদের কত কত সন্ধ্যা, এপাশ-ওপাশ রাত্রি—যার বসার ভঙ্গিতে
আজো লুকিয়ে রয়েছে পৃথিবীর আদিমতম বটের ছায়া, অজস্র শিশুর
দাঁতহীন হাসি...

সেই বৃদ্ধ বেহালাবাদক আর তার সবুজ আঙুলগুলো মাঝেমধ্যেই
ফিরে আসে আমাদের অপ্রাসঙ্গিক আড্ডায়—যেখানে হুটহাট ঢুকে
পড়ে ছাত্রী হোস্টেলের বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখা লাল-নীল
অন্তর্বাস—যা কিনা যেকোনো বাতাসেই একই রকম দোল খায়!

আমরা সবুজ আঙুল আর বেহালার বয়স্ক ন্দনের কথা বলি—বলি
একজন অন্ধ উঁইপোকা ও তার সুন্দরী প্রেমিকার গল্প...

সেই বৃদ্ধ বেহালাবাদককেই খুঁজি, যার হাতের ওঠা-নামার ভেতর
হারিয়েছি পরিচয়পত্র ।

বিকেল, মনে মুনিয়া

বিকেলের আগেই ঘুরে আসা ভালো ভোরের শিশির,
নামমাত্র বন্ধুত্ব—চোখের পর্দা থেকে ঝেড়ে নেওয়া
ভালো রাত্রির ঘুম, অন্ধকার—দেখে নেওয়া ভালো
সকালের দাঁড়ি-কমা, গানের দুপুর—বুঝে নেওয়া
ভালো বকুলের বাকিখাতা

বিকেলের খোলা মাঠে শুধু ছায়াই দীর্ঘ হয় না—মনেও
ওড়ে মুনিয়া পাখি—তাই তো বিকেল হলেই গড়াগড়ি
শুরু করে শৈশবের বল—কেঁপে ওঠে সপ্তম শ্রেণী—
প্রাইভেটের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে চৌধুরীবাড়ির মেয়েরাও

বিকেলে আমি না-ও থাকতে পারি, নিজের ভেতর থেকে
বেরিয়ে পড়তে পারি অযথাই—ঘোষণা ছাড়াই ছড়িয়ে
পড়তে পারি দূরে, অতীতে...

সতিনের ছেলে

কে খেয়েছে—এমন প্রশ্নে হাত তোলে সিগারেট—সিগারেটকে জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে
আসে তোমার নাম—তোমার আঙুল কম্পমান পানশালার দিকে—শুনেছি, পানশালার
নির্জন টেবিলে ধরা পড়ছে কবিতা—কবিতাকে তুমি সবচে সতিন ভেবেছিলে!

আমি সেই সতিনের ছেলে—মাঝেমাঝে ভুল করে ঢুকে পড়ি তোমাদের গেস্টভর্তি
ড্রয়িং রুমে—পড়া না-পারা বালকের মতো বুঝে নিই তোমাদের কর্তৃত্বপ্রধান চোখ—
জানি না পৃথিবীর পড়াঘরে আর কতদিন মাস্টারি হবে—শিশুর গালে থাপ্পড় মেরে
আর কত করা হবে ঈশ্বরের মনখারাপ!

মনখারাপের পৃষ্ঠা উল্টাই, ভাবি—আহা! সতিনের শাড়িটা আজো সবচে
বেশি সুন্দর—তার ছেলেটাই আজো ভাত বেশি খায়!

অপাদি, আপনাকে...

অপাদি, আপনাকে দেখার পর হঠাৎ মনে হলো—সবুজ ভালোবাসি কেন—কেন উড়োজাহাজের চে ঘাসফড়িং বেশি প্রিয়! কত কিছুই মনে হলো—নিজের স্থূলতা, অক্ষমতা বেশি করে সামনে আসতে শুরু করলো—অগোছালো চলাফেরার জন্য এই প্রথম খারাপ লাগলো—মনে হলো গায়ের জামাটা আয়রন করে পরা ভালো—পায়ের স্যান্ডেলটা আরেকটু মানসম্মত হলে মান বাঁচতো—মনে হলো নিজের পা-টাই ফিরে ফিরে উঠছে বুকে!

আপনাকে দেখার পর মনে হলো—ঈশ্বর খুব সুন্দর চোখ বানাতে পারেন—গভীরতা দিতে পারেন, ঘুম মেখেও দিতে পারেন চোখে—মানুষের মুখে লুকিয়ে রাখেন দেবীর ছবি—মনে হলো ঈশ্বর খুব সুন্দর মানুষ বানাতে পারেন, মানুষের চোখে মেখে দিতে পারেন হরিণের চোখ—মনে হলো তিনি খুব নাকও বানাতে পারেন—নাকে তুলে দিতে পারেন ইশারার উঁচু হাত!

আপনাকে দেখার পর খুব মনে হলো—কিছুটা মানুষ হওয়া
ভালো—ভালো শিল্পের প্রেমের জীবন...

দেবলীনাদের গল্প

আরেকটু সামনেই দেবলীনাদের বাড়ি—যেখান থেকে শুরু পৃথিবীর সব বড় নদী ছোট হওয়ার গল্প—আমরা হাঁটছি অস্তিত্ব সংকটের পথ ধরে, পথটা ক্ষুধা পর্যন্ত গিয়ে মৃত্যুর দিকে বেঁকে গেছে—ভূমিহীনপাড়ার ছেলে শুক্কুর আলীকে দেখেই এইসব পড়ে নিতে পারো, বন্ধু—এ পথের ব্যবচ্ছেদ করতে পারলে তুমিও জেনে যাবে দেবলীনাদের সামাজিক উচ্চতা, দু-একটি ঘুরে দাঁড়াবার ইতিহাস

ওইতো দেবলীনাদের বাড়ি—গেটে যার সরকারি কুকুর—অস্তিত্ব সংকটের পথটার শুরু ওইখান থেকেই—আমাদের কাঁধে হাত রেখে, সভ্যতার চোখে কুয়াশা ছড়াতে ছড়াতে যে পথ চলে গেছে চূড়ান্ত ক্ষুধার কাছে—ক্ষুধা, ক্ষুধা মানে প্রকৃত কান্না—দেবলীনাদের চোখ যে কান্না কখনো কাঁদেনি

দেবলীনাদের হাসি? ওদিকে সবার তাকাতে নেই ।

দুই

দেবলীনাদের হাসি দেখে একটাও ঘর বানাতে নেই—এটুকু বুঝতে বুঝতেই সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে—বেদনা চিনে ফেলেছে বাড়ি—ঘরদোর ফাঁকা রেখে বেশি দূর যাওয়া হয় না তাই—অথচ, সূর্য হেলে পড়ার আগেই দিগন্তের 'লাল' ছুঁয়ে আসার কথা—পথভোলা পথিককে তুলে দেওয়ার কথা জীবনপ্রধান সড়কে...

দেবলীনাদের হাসি দেখে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে নেই—এটুকু বুঝতে বুঝতেই মাথায় কাশবনের উঁকিঝুঁকি—কুয়াশার দখলে প্রিয় মাঠ, রবীন্দ্রনাথ... । অথচ, বিকেলের আগেই নির্ভার নিজেকে পৌঁছে দেওয়ার কথা আশ্চর্য গানের পাশে

গান এখন একা একাই বাজে...

তবু, দেবলীনাদের হলুদ ওড়না দেখে দেখে কত জীবন জন্ডিসে ঢুকে পড়ে!

সত্য-মিথ্যা

আমার শৈশবের বড় বড় মিথ্যেগুলো □মেই ছোট
হয়ে আসছে—কোনো কোনো মিথ্যে এখন সত্যের মতো
সামনে এসে দাঁড়ায়! কোনোটা তো দূরে দাঁড়িয়েই □মাগত
কুয়াশা ছড়ায়—কোনোটার সামনে পড়লে আবার
আমিই ছোট হয়ে যাই!

আমার শৈশবের বড় বড় সত্যগুলোও □মে ছোট হয়ে
আসছে—কোনো কোনো সত্য এখন মিথ্যের কাঁধেই হাত
রেখে চলে—কোনোটা শুকিয়ে যাওয়া নদীর মতো...
কোনোটা তো আজ আর ঘরেই ফেরে না!

সত্য-মিথ্যের প্রসঙ্গ এলে এখন আমি আকাশের দিকে
তাকাই—কেননা, ওদিকে তাকানো ছাড়া আমার মন
ভালো হয় না—খারাপও হয় না।

পাহারাদার

হাতের রেখায় নদী আছে, এমন চুপচাপ অহংকার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি পথে—হেঁটে
হেঁটে এরই মধ্যে বেশ পুরনো করে ফেলেছি এই রক্ত-পুঁজ-বিষণ্ন শহর—আজকাল
সিনেমার পোস্টার দেখে দাঁড়াই না, মঞ্চের পেছনের রহস্যও আর ভাবায় না
আমাকে—এখন নিজেকেই নিজের সম্মুখ থেকে বারবার সরিয়ে দিই—
সমূহ-গোলাপের উদ্দেশে বলি; সবজির কাতারে আসুন

হাতের রেখায় নদী আছে, এমন চুপচাপ অহংকার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি পথে—যদিও
পৃথিবীর বলিরেখায় □মেই জমা হচ্ছে শীত—বেড়ে যাচ্ছে হিমালয়ের অভিমান,
ফুজিয়ামার নখ...

আধশোয়া পাহারাদারের মতো থেকে থেকে উঠছি কেঁপে—এ দিকেই
আসছে সভ্যতার যত কফ, থু-থু...

সম্পর্ক

সম্পর্কের খাতা খুলে দেখি—পৃষ্ঠার ওপর দিয়ে
ধেয়ে গেছে ঝড়, হেঁটে গেছে জল,
ঝড়ের সঙ্গে জলের ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গেছে খুব
কিছুই পড়া যাচ্ছে না

তবু, সম্পর্কের নতুন খাতা খোলার অভিপ্রায়
আমাকে দৃশ্য জমাতে বলে—হাসি জমাতে বলে,
শব্দ জমাতে বলে

এই সব দৃশ্য, হাসি ও শব্দের ধাঁধার ভেতর
কত গান একা একা বাজে!

ফুলসঙ্কটের দিনে

যারা নদী ও পাহাড়ের গল্প বয়ে বেড়ায়
আর মাথায় নিয়ন আলোর অভিশাপ নিয়ে
অন্ধকারে কাটায় অবসর, আমি তাদেরও
বলবো না তোমার কথা—কেননা, ফুলসঙ্কটের
দিনে পৃথিবীতে ভ্রমরের সংখ্যা বেড়ে যায়!

আমি নিঃসঙ্গ দুপুরে হেঁটে যাওয়া মালির পদধ্বনির
সঙ্গে ফুলফোটার শব্দ মিলিয়ে যেতে দেখি, আর
এখানে ওখানে লিখি 'অপেক্ষা'।

ভাবের মোড়ে

আমার পেছনে মোগল সম্রাট, সামনে তুমি; সঙ্গে নগর ট্রাফিক—আমি সম্রাটকে ট্রাফিকের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে ভাবের দিকে কেটে পড়ি—ভাবের মোড়ে সিগারেটের দোকান—দোকানির চোখে বৃষ্টিবিরোধিতা—বৃষ্টির পায়ে ফিরে আসে ভুলে যাওয়া গান—গানের কোথাও বেতন বাড়ার প্রসঙ্গ নেই—তবু, অনিতার চোখে আলো পড়ে—ঘরের দিকে পা চলে যায়

ঘরের প্রসঙ্গ তুলবো না আর—শুনেছি, ঘর ও জানালার শত্রুতা আজো পৃথিবীর আদালতে সবচে পুরনো মামলা—মামলার দিকে যাই না আমি, পাগলার দিকে যাই—পাগলা? ২১টা সুপারির 'লাল'-এ যে একদিন সারাদিন হেসেছিল! হাসির কথাই হোক—বিলবোর্ডের সমস্ত হাসি একদিন পাগলের হাসির কাছে ক্লিশে হয়ে যাবে—নিখুঁত হাসির জন্য তারাই হবে শিল্পের অনির্বচনীয় অভিভাবক

...আর কোনো এক অনাসক্ত পাগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার কথা ভেবে—আমি হবো রাজহাঁসের মতো অহংকারী ।

রেলগাড়ি

নদী হত্যা করে কারা যেন রেলগাড়ি ছেড়ে দিয়েছে পৃথিবীতে—যার তীব্র হুইসেলে একদিন ভয়ঙ্কর কেঁপে উঠেছিলো আমার দ্বিতীয় শ্রেণী—আজো সেই কম্পন ঘুমের ভেতর বাজে—আজো সে সাপের মতো হেলে-দুলে চলে...

কারা যেন ঘুমের ভেতর ছেড়ে দিয়েছে রেলগাড়ি—সেই থেকে খুঁজে পাচ্ছি না ব্যক্তিগত নৌকা, ভাটিয়ালি...

ভাবছি, একদিন বন্ধুদের নিয়ে বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণে যাবো—আর সেদিন টিটি এসে টিকিট চাইলে মৃত নদীদের ডেকে বলবো: 'হাসাহাসি করো'...

দুই

রেললাইন দীর্ঘ হয় কেন, বেদনা বোঝাতে? নাকি দূর দীর্ঘশ্বাসে ঘুড়ি ওড়াতে! এই সব ভেবে ভেবে স্টেশন ছাড়ি—যেমন ছেড়ে গেছো তুমি, চলে গেছে প্রকৃত বসন্তকাল, অথবা নদী সভ্যতার ফুরফুরে হাওয়া...

রেললাইনের দূর, কী আছে ওই দূরে! নদী ভালোবাসে এমন বাতিওয়ালাই হয়তো জানে : কত কান্না কুয়াশা হয়ে ছড়িয়ে থাকে রেললাইনের পথে পথে...

রেললাইনের ওই দূরে, ওই কুয়াশাময় ভোরে পড়ে থাকে শীতকাল, মৃত নদীদের আত্মা নিয়ে ।

জামতলা

মাঝরাতে কলাবাদুড়েরা খেয়ে গেছে
আমি এখন ভোরের জামতলা
এখানে কেউ আসে হাওয়া খেতে,
কেউ আসে ডাক্তারের নির্দেশে
তুমিও এসেছিলে, এসেছিলে প্রস্থান মনে

আমি তো ভোরের জামতলা
বাদুড় আর কাঠবিড়ালের বিরোধ নিয়ে
থেতলানো জামের মতো তাকিয়ে আছি।

পায়রা

রাষ্ট্রপতির হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়া পায়রাটা
দেখে—আমার বোধের ভেতরও একঝাঁক পায়রা
উড়ে গেল...

রাষ্ট্রপতি পায়রা বি□তার ঠিকানা জানেন,
অথচ, পায়রা কেন উড়তে ভালোবাসে—এমন প্রশ্নের
জবাবে উপস্থিত সকলেই বিব্রত বোধ করলেন!

এসব রাষ্ট্রপতির হাত ফসকে পৃথিবী কবে বের হবে?

কথা, পাহাড়ের সঙ্গে

পাহাড়, তোমাকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে—বিশেষত মনমরা বিকেলে
কী করো তুমি—কার কথা ভাবো—কে তোমার কান্নাকে প্রথম ঝরনা
বলেছিলো? আমি? আমি দু-চারটা সিগারেট বেশি খাই, চুপচাপ
ঘুরি-ফিরি—দাড়ি কেন কাটতে হবে, ভাবি...

মাঝেমাঝে নিজেকে শৈশবের হাতে তুলে দিয়ে ঘড়ি দেখি—ঘড়িতে
৩৪টা বাজে! ফুল পাখি নদী ওরা কেমন আছে?

পাহাড় তুমি কি জানো, রজনীগন্ধা সবজি নয় কেন!

স্কাউটবালিকা

মুঠোভর্তি রোদ ঘরে আনতে পারেনি বলে যে বালক সারাটা দুপুর
অভিমানের ভেতর বসে আছে, আমি তার মুখচ্ছবি আঁকি—আঁকি
রোদ্দুরে হারিয়ে যাওয়া দূর মুনিয়া পাখি

বিষাদের ভাই হয়ে বসে থাকি, রাত্রির হাত ধরে বাঁশঝাড় কাছে
এসে বলে 'জোনাকিদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে বলো'; আমি তাদের
দুধমাখা ভাতের লোভ দেখাই—বলি, স্কাউটে ভর্তি হয়ে যাও
তোমরা সবাই...

স্কাউটের বেল্টবাঁধা সেই বালিকা—আজো কেন বুকের ভেতর
লেফট-রাইট করছে!

পানসি

যতটা বয়স পেরোলে কোলবালিশটাকেও জীবিত মনে হয়—মনে হয়
ঘরের ভেতর আরেকটি ঘরের প্রয়োজন—প্রয়োজন স্নানের জল তুলে
রাখা—ততটা বয়স পেরিয়ে এসে পুরনো সেই নদীর চোখে দেখি—
কিছু জল শুকিয়ে গেছে—কিছুটা মায়ের চোখে, আর কিছুটা আমিও
খেয়েছি সাকুরায় বসে

জলবিষয়ক সমস্ত কোলাহল সেচে ফেলে—আবার কেউ নদী
হলে—বাকিটা পথ আমি পানসি হয়ে চলে যেতাম ।

গোপন সন্ন্যাস, কবিতার দেশে...

বেহালার মতো ইচ্ছে করে খুব বেজে উঠি
করুণ কান্নার মতো ছুঁয়ে যাই গোপন সন্ন্যাস
রাত্রির কপাট খুলে ঘুরে আসি নিজের কবর
অমোঘ আশ্রয় চাই শব্দের কাছে, কাব্যের দেশে

উপুড় আকাশ যেন দ্বিধাহীন সমুদ্রের চোখে
তাকিয়ে রয়েছি আমি অনিমেষ প্রেমজাগা বুকে ।

কাক-কোকিল ভোরের গান

সমস্ত রাত্রিকে ভোর পর্যন্ত টেনে এনে আমি খুব হাসাহাসিতে পড়ে যাই!

এই কাক-কর্কশ শহরে ভোর বিষয়ে তেমন কারো আগ্রহ নেই—তাহলে
এই সব নির্ঘুম রাত নিয়ে আমি কার কাছে দাঁড়াবো? কার হাতে তুলে দিয়ে
বলবো : অনেক সিডিল অথবা স্যারিডনকে আমি পরাজিত করেছি!

ভোর জেগে ওঠার সময় পৃথিবীর সব সরুগলি প্রশস্ত হয়ে যায়—ডাস্টবিন
ঘিরে থাকা কুকুরের লেজে নড়ে ভালোবাসার 'না'—সব ক্লান্তি এসে পড়ে
সেই বিছানাবিনোদিনীর পায়ে—ভোর হবার আগেই যাকে ঘরে ফিরতে হয়
অনেক দরজা খুলে, অনেক সিঁড়ি ভেঙে—অনেক নখ ও দাঁতের হিংস্রতা নিয়ে...

সমস্ত রাত্রিকে ভোর পর্যন্ত টেনে এনে আমি খুব হাসাহাসিতে পড়ে যাই!
কাক-কর্কশ গান আর অ্যাম্বুলেন্সের বিলাপ ছাড়া কিছুই নেই এখানে—তবু
প্রিয় জানালাটা উদ্যানে গিয়ে পড়ে, যার শীতল শিক দুহাতে ধরে
আমি আমার ব্যক্তিগত পৃথিবী নাড়াই ।

সপ্তম শ্রেণী থেকে কুয়াশা পর্যন্ত

আমার মন খারাপ হলে একটাও জানালা নিভে যায় না কোথাও—একটাও
প্রজাপতি হারায় না উড়াল—কেবল লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা একটা
বিড়াল প্রশ্নবোধক তাকিয়ে থাকে—তাকিয়ে থাকে সপ্তম শ্রেণী থেকে
কুয়াশা পর্যন্ত...

সপ্তম শ্রেণীতেই তুমি মোমের পুতুল সেজেছিলে?

থাক সে, মনখারাপের কথা বলি—বলি কোনো এক শুকিয়ে যাওয়া নদীর
গল্প—যার কথা ভেবে আজো আমি সাঁতারের পোশাক পরে আয়নায় দাঁড়াই

আজো তোমাদের উঠানে প্রতিদিন বিকেল নামে—প্রতিদিন বিকেলে আমার
রোদচশমাটাও অদরকারি হয়ে ওঠে—জানি না, অদরকারি শব্দটার সঙ্গেই
আমার মনখারাপের সখ্য হলো কি-না।

উল্টোপথ

যে মন্দিরে আর ঘণ্টা বাজে না আমি তার প্রতিবেশী, মসজিদও
খুব কাছে নয়—সন্ধ্যায়, প্রার্থনার হাওয়ায় মন রেখে আমি তাই
উল্টোপথে হাঁটি...

উল্টোপথে মসজিদ নেই, মন্দির নেই, কেবলই প্রশ্নের
বিড়ম্বনা—সেই প্রশ্ন, যার উত্তরে অনায়াসে বলে দেওয়া যায়
'কুয়াশা-কুয়াশা' কুয়াশা! যা কিনা পৃথিবীর যাবতীয় শিল্পকে
অবমানোনার হাত থেকে রক্ষা করে

উল্টোপথেই হাঁটি, শুনেছি এ পথেই পাওয়া যায় ডোডোপাখির
বরফাচ্ছন্ন ডানা, আদিমতম গুহার ওম, আর ব্যক্তিগত
আকাশের খোঁড়াখুঁড়ি...

ঝরাপাতার উপহাস

আবার শীত এলে আমি সবটুকু আকাশ ছেড়ে দেবো
অতিথি পাখিদের, জলাশয়ের কাছে যাব না, বাজাবো
না সিটি, কেননা পাখিদের অবাধ ওড়াউড়ি পৃথিবীতে
যে গানের আবেশ ছড়ায়, আমি তার টুকিটাকি
জমিয়ে রাখি

আবার শীত এলে আমি ভাঁপা পিঠার ফেরিওয়ালা হবো,
কার্ডিগান বেছবো শহরের অলি-গলি—কেননা, ভাঁপা পিঠার
ধোঁয়ার সঙ্গেই কেবল তনুশ্রীদের হাসির বিনিময় সঙ্গত

আবার শীত এলে আমি মরেও যেতে পারি
ছড়িয়ে ঝরাপাতার উপহাস...